উগ্র নারীবাদী যুগেও আশাপূর্ণা দেবীর প্রাসঙ্গিকতা

ঊষা রায়

সাহিত্যের কাজ, জীবনের অভিব্যক্তির প্রকাশ ও ব্যাখ্যা। মানুষের সুখ - দুঃখ ও জীবন সংগ্রাম এবং জীবনের প্রতি ভালবাসা ও ঔজ্জ্বল্যময় জীবনের ছবি ফুটিয়ে তোলাই সাহিত্যের কাজ, উদ্দেশ্যও। সাহিত্য তাই জীবনের ভাষ্যকার ও পথিকৃৎ।

মনোজ বসুর এই উক্তি আশাপূর্ণা দেবীর কলমে পূর্ণ প্রতিফলিত হয়ে জীবনের জলছবির রঙ ধরিয়েছে। আশাপূর্ণা এই নামের মধ্যেই নিহিত আছে সেই দ্যুতি, যা আমাদের আশাকে পূরণ করার আভাস দেয়। সাহিত্যের অঙ্গনে দরদী কলমের মাধ্যমে তিনি মিটিয়েছেন আমাদের পূর্ণ প্রত্যাশা। আশাপূর্ণা যখন কলম ধরেন সাহিত্যের আকাশে বহু জ্যোতিষ্কের কলমই তখন সরব। তারই মধ্যে ওনার কলমি চারা একটু একটু করে ডালপালা ছড়িয়ে একসময় মহীরুহ হয়ে ওঠে। 'আমার সাহিত্য' সম্পর্কে লিখতে গিয়ে উনি জানিয়েছেন, 'আমার পাঁচ বছর বয়েসে নতুন বাড়িতে বাবা সপরিবারে ভাড়া উঠে এলেন। সে বাড়ির ছাদে উঠে আমি আর দিদি চেঁচিয়ে উঠেছিলাম, —এ বাড়ির আকাশটা কি নীল। যেন একটা অবিষ্কার। কিন্তু পরক্ষণেই বাবার নির্দেশে ন্যাড়া ছাদে দরজা পড়ে গেল। গেল তো গেলই, এ যুগের ছেলে মেয়েতো নই যে, হাতপা ছুঁড়ে বন্ধ দরজা খুলিয়ে ছাড়ব। বন্ধ মানেই বন্ধ।

অতএব জানালা দিয়েই আকাশ দেখা জগৎ দেখা।

এই জানালা দিয়েই দেখার জগৎ যে তাঁর ক্ষেত্রে কোন অংশেই সম্পূর্ণ নয়, বাইরে থেকে দেখার অভিজ্ঞতায়, বরং বহুলাংশে বিস্তৃত, সেটাই প্রমাণ করেছে ওঁনার অসাধারণ লেখনী, স্বচ্ছ লেখনীও অন্তরিক বেদনাবোধ।

পনেরো বছর বয়সে কৃষ্ণনগরে বধূ হয়ে যাবার পর বছরখানেক অনেক ক্ষুধার্ত দুপুর কাটাতে হয়েছে গঙ্গার জোয়ার ভাঁটার সময়, প্রসিদ্ধ তীর্থ সমূহ ও বৃহৎ বাঁধাকপি ও রাক্ষুসে মূলোর বিবরণ পড়ে। কারণ সে বাড়িতে বাংলা বই বলতে ওই একটাই ছিল 'নতুন পঞ্জিকা'। তবে সুখের বিষয় এই অবস্থা বেশী দিন টেকেনি। ওঁনারা ভবানীপুরে এসে বাসা নিয়ে বসবাস সুরু করলেন। ডাঙ্গার মাছের আবার জলাশয় জুটলো।

এই স্মৃতিচারণ থেকে বোঝা যায় সাহিত্যের পরিবেশ সব সময় অনুকূল ছিল না তাঁর পক্ষে। এই প্রতিকূলতাকেই নিজের অনুকূলে এনে সংসারের সব প্রয়োজন মিটিয়ে এগিয়ে গেছেন নিজের সঙ্কল্পের দিকে। এইখানেই আশাপূর্ণা অনন্যা।

তেরো বছর বয়সে প্রথম লেখার আত্মপ্রকাশ। কবিতার নাম 'বাইরের ডাক'। পত্রিকাটির নাম শিশু সাথী। পরেরটি গল্প— নাম 'পাশাপাশি'।

এইভাবেই এগিয়ে চলা। প্রথমে ছোটদের জন্যে লেখা। পরে সম্পাদকের অনুরোধে ও প্রেরণায় বড়দের জন্যে লেখা। তবু তিনি নিজেই জানিয়েছেন, — যা আমি দেখিনি, যে আপামর জীবন আমার দেখার বাইরে, তা নিয়ে আমি লিখিনি।

তাঁর লেখা দেড়শর ওপর উপন্যাস ও অসংখ্য ছোট গল্পের মধ্যে বিস্ময়কর এবং আমাদের সম্পূর্ণ অপরিচিত চরিত্র তেমন ভাবে পাই না। পাই আমাদের একান্ত পরিচিত পাশের বাড়ির মেয়ে বৌ, কাকিমা, জ্যাঠামশাই, কাকা, মামাদের। যাদের নীরব সংগ্রাম জীবনে বেঁচে থাকার আর্তি, ছোট গণ্ডিবদ্ধ ঘেরাটোপের মধ্যে থেকেও উত্তরণের আকাঙ্ক্ষা আমাদের আনন্দিত ও উৎসাহিত করে।

শরৎচন্দ্র যেমন তাঁর অসামান্য লেখনী দিয়ে দেখিয়েছিলেন আমাদের প্রত্যহ দেখা আটপৌরে মেয়েটির মধ্যেই নিহিত আছে জ্বলে ওঠার আগুন, সেই ভাবে আশাপূর্ণা জানিয়েছেন আমাদের নেহাৎ সাদামাটা অতি নিরীহ মেয়েটার মধ্যে মহৎ এক উত্তরণের ব্যাকুলতাই গণ্ডিবদ্ধ জীবনের পথ কেটে এগিয়ে যেত চাইছে। পরিচিত ঘেরা টোপের মধ্যেই চরিত্রটি ফর্ম ভাঙার সঙ্কল্পে দৃঢ় বদ্ধ পরিকর। সবকিছু ক্ষুদ্রতা তুচ্ছতাকে জয় করে চরিত্রটি তাঁর কলমে হয়ে উঠেছে অন্যান্য। এইখানেই আশাপূর্ণা দেবীর স্বকীয়তা।

রাজীব গান্ধীর প্রধান মন্ত্রিত্বের আমলে সাহাবানু মামলা নিয়ে বিতর্কের সময় তিনি বলেছিলেন, —যে স্বামী অকারণে কিংবা তুচ্ছ কারণে তালাক দেবার মত অসম্মান করল, তার কছে থকে এরপরেও খোরপোষ নেবার মত অপমান নেনে নেয়া যায় না।

এই আত্মমর্যাদাবোধই তাঁর সৃষ্ট প্রতিটি চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। এই আত্মমর্যাদাবোধ, বিশেষ করে নারীর ক্ষেত্রে তুলে ধরাই তার লেখনীর উদ্দেশ্যও।

আশাপূর্ণার উপন্যাসত্রয়ী, —প্রথম প্রতিশ্রুতি, সুবর্ণলতা, বকুলকথা প্রতিবন্ধকতা মেনে নেয়া, মানিয়ে নেওয়ার সঙ্গেও আছে আত্মমর্যাদাবোধ ও চেতনা। স্বাধীন সত্তার উন্মীলন । তাঁর সৃষ্ট চরিত্ররা আধুনিক নারীবাদী পুরুষ বিদ্বেষী চরিত্র নয়। স্বাধীন সত্তার উন্মীলন। তারা পুরুষের পাশে থেকে পুরুষকে ভালবেসে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার জায়গা খুঁজে নেয়। এখানেই তাঁর স্বতন্ত্রতা।

সমাজ সংসার নারী পুরুষ উভয়কে নিয়েই। পুরুষ আমাদের শত্রু নয়। পুরুষ ছাড়া নারী কি সম্ভব? নাকি নারী

ছাড়া পুরুষ? সৃষ্টিকর্তা অনেক বুঝেই পরস্পরের প্রয়োজনে পরস্পরকে সৃষ্টি করেছেন।

আশাপূর্ণা দেবীর সাহিত্যে এই কথাই বারবার প্রতিফলিত হয়েছে। তিনি তাই সাহিত্য আকাডেমির ফেলো নির্বাচিত হলে সেই উপলক্ষে তাঁকে এক সাহিত্য গোষ্ঠীর তরফ থেকে সংবর্ধনা জানাতে গিয়ে এক বিতর্কিত লেখিকার প্রসঙ্গে দু'চার কথা উঠলে তিনি নির্দ্বিধায় বলতে পেরেছিলেন, ওই বিতর্কিত নারীবাদী মহিলার প্রসঙ্গে কিছুই বলতে চাই না। শুধু এইটুকু সত্যি, পুরুষকে ওইভাবে শত্রুর ভূমিকায় দেখার দরকার কি? সে তো আমার স্নেহময় স্বামী একান্ত আপনজন পুত্র। তাদের ছাড়া কি জীবন সেভাবে সম্পূর্ণ হয়?

হয়তো তাঁর এই উক্তি নিয়ে বিতর্কের ঝড় উঠতে পারে। তবে আশাপূর্ণা আশাপূর্ণাই। তিনি আমাদের আশাকে ধরে রাখেন, হতাশার মধ্যে ঠেলে না দিয়ে। আমাদের প্রত্যাশা পূরণের দলিল আশাপূর্ণা।

যদিও আশাপূর্ণার সাহিত্যকে কেউ কেউ মেয়ে পাঁচালী বলে এক পেশে করে রাখতে চায়, কিন্তু সেই মেয়ে পাঁচালী কতটা মেয়েলি -ও কতটাইবা জীবনের পাঁচালী হয়ে উঠেছে, সে অনুভূতির কথা কি তাঁরা সে ভাবে অনুধাবন করেন?

'নারীর সমস্যা নারীই বোঝে ভাল' ডঃ সুকুমারী ভট্টাচার্যের এই মন্তব্য আশাপূর্ণা দেবীর সাহিত্যে পূর্ণ প্রতিফলিত।

সমরেশ বসু তাঁর 'মানুষ শক্তির উৎস' উপন্যাসের প্রধান নারী চরিত্রের মুখ দিয়ে বলিয়েছেন, নিজের কথা লিখতে চাই, জানি আশাপূর্ণা দেবীর মত লিখতে পারবো।

অর্থাৎ মেয়েদের জগৎকে তাঁর মত দেখার দক্ষতা যে একজন পুরুষ ঔপন্যাসিকের নেই, সেই কথাটাই বুঝিয়েছেন সমরেশ বসু তাঁর সৃষ্ট চরিত্রের মুখে ওই কথা বসিয়ে।

কথা সাহিত্য পত্রিকা থেকে অনুরোধ এলে এবং মিত্র ঘোষ - এর ভানু রায়ের তাগাদায় তাঁর ট্রিলজির প্রথম উপন্যাস, 'প্রথম প্রতিশ্রুতি' ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়। এটি মিত্র ঘোষ থেকে বই আকারে প্রকাশ পায়। পরের উপন্যাস সাপ্তাহিক বসুমতী থেকে প্রকাশিত হয়—

ট্রিলজির দ্বিতীয় 'সুবর্ণলতা'। তৃতীয়টি প্রকাশ পায় কথা সাহিত্য থেকেই 'বকুলকথা'। প্রথম প্রতিশ্রুতি আনন্দ রবীন্দ্র ও জ্ঞানপীঠ পুরষ্কারে ভূষিত হয়। এত বছর পূর্বে গ্রামীণ পটভূমিতে লেখা 'প্রথম প্রতিশ্রুতি' -র প্রধান চরিত্র সত্যবতী সম্পূর্ণ প্রতিকূলতার মধ্যে থেকেও এক স্বাধীন সত্তায় নিজেকে প্রতিষ্ঠা করে। যে আদর্শবান কবিরাজ পিতা সত্যবতীর মনে আত্মমর্যাদার ভিত প্রোথিত করেন, সেই বাবার কাছে সত্যবতী প্রশ্ন রাখে, এতই যদি মেয়েদের এ করতে নেই ও করতে নেই, তবে মেয়ে হয়ে জন্মানো কেন?

শুধু সত্যবতী নয়, তাঁর সৃষ্টি সমস্ত চরিত্রই এই প্রশ্ন রেখেছে সমাজের কাছে।

বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের সভানেত্রীর পদে অলঙ্কৃত হয়ে তাঁর ভাষণে উল্লেখ করেছেন, 'মেয়েরা উপেক্ষা সইতে পারে না। উপেক্ষা করতেও জানে না। সমাজের সসম্ভ্রম দৃষ্টি আকর্ষণের আকাঙ্ক্ষায় নারীচিত্ত জগৎ অনেকখানি কৃত্রিমতায় ভরা। নিজের সম্পর্কে একটা ভাবরূপ গড়ে তোলার জন্য নারীর ত্যাগের, কৃচ্ছ্র সাধনের, পরিশ্রমের আর অভিনয়ের অন্ত নেই।'

নারী যেদিন এই মোহের নির্মোক থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে সেদিন প্রেয়র থেকে শ্রেয়কেই অধিক মূল্য দিতে শিখবে। আর পৃথিবীকে বুঝিয়ে ছাড়তে পারবে, পৃথিবীতে নারী পুরুষ দুটো জাতই সমান প্রয়োজনীয়। সেদিন সগৌরবে ঘোষণা করবে ক্ষুদ্র গৃহ কোণে আবদ্ধ থাকলেও আমি ক্ষুদ্র নই। 'আমার রয়েছে কর্ম, আমার রয়েছে বিশ্বলোক'।

সেদিনই হবে তার বন্ধনের যথার্থ অবসান। মুক্তি বস্তুটা আদায়ের নয় অর্জনের। এই বোধটাই আত্মিক মুক্তি সর্বাত্মক মুক্তি।

তবে আমাদের যা কিছু আশা আকাঙ্ক্ষা আলোচনা সবই মুষ্টিমেয় কয়েকটি উচ্চমানের শিক্ষিত মেয়েকে ঘিরে। এই আলোর মশালের পিছনে আজও লক্ষ লক্ষ মেয়ে চেতনাহীন অন্ধকারের মধ্যে নিমজ্জিত। তাদের মুক্তির পথ কোথায়? কে এনে দেবে তাদের চেতনা, কে বোঝাবে তাদের, কাকে বলে মুক্তি? সে চিন্তার দায়িত্ব কিন্তু মুষ্টিমেয় মেয়েরই। মুক্তি জিনিসটা কিন্তু একা ভোগের নয়। সমগ্রকে নিয়েই তার প্রকৃত স্বাদ।

দেশকে 'স্বর্গ' ও নারীকে 'দেবী' বলা, যে স্রেফ আত্মবঞ্চনা, এ কথা তাঁর কবিতায় প্রতিবাদ করে লিখেছেন—

তৃপ্তি পেতেছ কি তুমি শুধু শয্যাভাগিনী লভি?

মর্মে কর্মে যে নয়, শুধু কামনার ছবি।

আসলে যে পেল দাসীর আসন, দেবী বলে বাড়াও না।

সোনা সোনা বলে ফাটালে আকাশ, পেতল কি হবে সোনা?

ষাট বৎসর পূর্বে লেখা এ কবিতা আজও প্রাসঙ্গিক, আশাপূর্ণার সাহিত্যকে তাই আমরা মনে রাখবো সমান মূল্যবোধে।